ভারতীয় সিনেমায় থিয়েটারি রাজ

প্রেমেন্দ্র মজুমদার

মহেশ মঞ্জরেকর-এর ছবি 'নটসম্রাট' মারাঠি সিনেমার ইতিহাসে জনপ্রিয়তার এক বিপুল নজির সৃষ্টি করেছে। এখনও পর্যন্ত বক্স অফিস থেকে ৭০ কোটিরও বেশি টাকা আয় করেছে ছবিটি। আঞ্চলিক ছবির ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এটি একটি বড় মাপের রেকর্ড। ছবির মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন নানা পাটেকর। অন্যতম প্রযোজকও তিনি। ছবিটি মুক্তি পেয়েছে ২০১৬-র ১লা জানুয়ারি, নানা পাটেকরের ৬৫তম জন্মদিনে। কিংবদন্তী নাট্যাভিনেতা গণপত রামচন্দ্র বেলওয়ালকার, ওরফে আপ্পা তাঁর আইকনিক থিয়েটার জীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর ব্যক্তিগত জীবনে যে শেকস্‌পিরীয় ট্র্যাজেডির শিকার হন, নিপুণ দক্ষতায় তা তুলে ধরা হয়েছে ছবিটিতে। জীবনের রঙ্গ হল, রঙ্গমঞ্চে গণপত রামচন্দ্র বেলওয়ালকার 'নটসম্রাট' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন শেকস্‌পিয়রের বিভিন্ন নাটকে তাঁর অসামান্য অভিনয়ের জন্যই। 'নটসম্রাট' দেখতে দেখতে মনে হয় নানা পাটেকর এই ছবিতে তাঁর অভিনয় প্রতিভার সবটুকু উজাড় করে দিয়েছেন। যদিও আঙ্গিক ও উপস্থাপনায়, বিশেষত সংলাপের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত নাটকীয়তার জন্য আদর্শ সিনেমার নিরিখে এটিকে একটি মহৎ চলচ্চিত্র বলা সম্ভব নয়, তবু থিয়েটারের আবেগ ও সামগ্রিকভাবে থিয়েটারকে কাজে লাগিয়ে যে কীভাবে সিনেমার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট ভাষা ও সংস্কৃতির ব্যাপকতায় সম্পৃক্ত করে তোলা যায় তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন অবশ্যই 'নটসম্রাট'। নানা পাটেকরীয় যাবতীয় ম্যানারিজমকে গণপত রামচন্দ্র বেলওয়ালকারের জীবন যাপনে আত্মীকরণ করে নেওয়ায় বোঝা যায় না আমরা আসলে একটা লার্জার দ্যান লাইফ ইমেজের নাট্য-ব্যক্তিত্বকে দেখছি না অসম্ভব প্রতিভাবান এক অভিনেতাকে, যিনি সিনেমায় অভিনয়ের চালু সংজ্ঞাকে সাবলীল দক্ষতায় থিয়েট্রিক্যাল পারফরমেন্সে রূপান্তরিত করে ফেলতে পারেন এবং সেখান থেকে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতে পারেন অতি সহজেই এবং এমনি করে সিনেমা ও থিয়েটারে অভিনয়ের মধ্যবর্তী লক্ষণগণ্ডীকে অতিক্রম করে যেতে পারেন অনায়াসে আপামর দর্শককে সঙ্গে নিয়ে এবং তা মঞ্চ ও চলচ্চিত্র অভিনয়ের ধ্রুপদী রীতিকে অস্বীকার না করেই। অসম্ভব রকমের প্রতিভাবান কোনো মঞ্চাভিনেতার পক্ষেই বোধহয় এরকম উঁচু মাপের চলচ্চিত্রাভিনয় সম্ভব।

নানা পাটেকরের (জ. ১৯৫১) অভিনয়ে হাতেখড়ি নাট্যমঞ্চে, তাঁর ছাত্র জীবন থেকেই। তাঁর বাবা ছিলেন তাঁর নাট্যাভিনয়ের এক একনিষ্ঠ ভক্ত দর্শক। মুম্বাইতে যখন তিনি 'বাল্মিকী' নাটকে অভিনয় করছেন তখন তাঁর বাবা পুনে থেকে বম্বে চলে এসেছিলেন শুধুমাত্র পুত্রের অভিনয় দেখার জন্য। শৈশবে প্রবল দারিদ্র নানা পাটেকরকে মাত্র ১৩ বছর বয়স থেকেই উপার্জনের পথ খুঁজতে বাধ্য করে। স্কুলের পর রোজ পায়ে হেঁটে পাঁচ মাইল দূরে গিয়ে সিনেমার পোস্টার আঁকতেন, মাস গেলে ৩৫ টাকা বেতনের বিনিময়ে। তাঁর নিজের ভাষ্য অনুযায়ী, প্রবল দারিদ্র, ক্ষুধা আর অপমান তাঁকে জীবনে এত কিছু শিখিয়েছে যে তাঁর আর কোনো কেতাবি অভিনয় শিক্ষার প্রয়োজন হয়নি। 'নটসম্রাট'-এও তাই আমরা তাঁকে যখন দেখি

খ্যাতির শিখর থেকে সব হারিয়ে শেষ জীবনে মুম্বাইয়ের রাজপথে এসে আশ্রয় নিয়েছেন সব হারানো মানুষজনের সঙ্গে এবং তাদের সঙ্গেই আপনজনের মতো ফুটপাথে বাসা বেঁধেছেন খোলা আকাশ মাথায় নিয়ে তখন একটুও মনে হয় না তিনি অভিনয় করছেন, বরং মনে হয় তিনি যেন তাঁর জীবনের ফেলে আসা কোনো অধ্যায়েরই পাতা ওলটাচ্ছেন পরম মমতায়। জীবন মানুষকে অনেক কিছু শেখায়। এবং প্রতিনিয়ত সে তা শিখিয়েই চলে। চোখ-কান খোলা রাখলে জীবনের এই শিক্ষাকে পাথেয় করে অনেকটা রাস্তা হাঁটা যায়, এমনকি অন্ধকারেও। অধ্যাবসায় থাকলে গন্তব্যে পৌঁছনো যায়। একজন অভিনেতা যেহেতু বেঁচে থাকেন অসংখ্য জীবনের মধ্যে, তাঁর অভিনয় জীবনের সাফল্যও নির্ভর করে তাঁর ওই টুকরো টুকরো জীবনগুলির শিক্ষা থেকে। এবং থিয়েটারই কেবল পারে তাঁকে সঠিকভাবে এই শিক্ষা দিতে। পরিত্যক্ত জীর্ণ রঙ্গালয়ে নটসম্রাট-এর আত্মানুসন্ধান দেখতে দেখতে আমরা একসময় ভুলে যাই যে আমরা কোনো শেকস্‌পিরীয় ট্রাজেডির নায়ককে থিয়েটারের মঞ্চে আত্মস্থ অভিনয় করতে দেখছি না এক অতি বড় মাপের চলচ্চিত্রাভিনেতাকে সিনেমায় অভিনয় করতে দেখছি। ভারতীয় সিনেমার বৈশিষ্ট্যই হল থিয়েটারের কাছে তার বিপুল ঋণ। এই ঋণ যে ভারতীয় সিনেমাকে কীভাবে সমৃদ্ধ করেছে তা অনুসন্ধান করতে গেলে হয়তো সিনেমার পক্ষে সহায়ক কোনো নতুন পথের দিশা পাওয়া যেতে পারে।

পার্শি থিয়েটারের জনপ্রিয় অভিনেতা সোহরাব মোদি (১৮৯৭-১৯৮৪) তাঁর ভাইয়ের থিয়েটার কোম্পানিতে কাজ করেছেন দীর্ঘদিন। মূলত শেকস্‌পিয়রের বিভিন্ন নাটকে তাঁর অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করে রাখত। ১৯৩৬-এ তাঁর বিখ্যাত স্টুডিও 'মিনার্ভা মুভিটোন' তৈরির আগেই, সিনেমার দাপটে রঙ্গমঞ্চের অস্তিত্বের সংকট মোকাবিলায় তিনি তাঁর প্রথম উদ্যোগ 'স্টেজ ফিল্ম কোম্পানি' (নামটি লক্ষ্যণীয়) তৈরি করেন ১৯৩৫-এ, যার প্রথম দুটি প্রযোজনার একটি শেকস্‌পিয়রের 'হ্যামলেট' অবলম্বনে 'খুন কা খুন' (১৯৩৫) এবং অন্যটি শেকস্‌পিয়রের 'কিং জন' অবলম্বনে 'সঈদ-ই-হাওস' (১৯৩৬)। সোহরাব মোদির শ্রেষ্ঠ ছবি 'সিকন্দর' মুক্তি পায় ১৯৪১ সালে। সোহরাব মোদি পরিচালিত, প্রযোজিত ও অভিনীত এ ছবি পৃথ্বীরাজ কাপুরকে (১৯০৬-১৯৭২) বিপুল জনপ্রিয়তা এনে দেয়। যদিও পৃথ্বীরাজ তখনও পর্যন্ত প্রায় গোটা বারো ছবিতে কাজ করেছেন যার মধ্যে আরদেশির ইরানি'র 'আলম আরা' (১৯৩১) থেকে শুরু করে নিউ থিয়েটার্সের ব্যানারে দেবকী বসুর 'সীতা' (১৯৩৪) ও 'বিদ্যাপতি' (১৯৩৭), প্রমথেশ বড়ুয়ার 'মঞ্জিল' (১৯৩৬) এর মতো বিখ্যাত সব ছবি আছে। তবু 'সিকন্দর'ই (১৯৪১) তাঁকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে নিয়ে যায়। পৃথ্বীরাজের অভিনয় জীবন শুরু পেশোয়ারের রঙ্গমঞ্চে। ভাগ্যান্বেষণে বম্বে শহরে এসে সিনেমায় যোগ দিলেও রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তিনি কখনও সম্পর্ক ত্যাগ করেননি। নিয়মিত থিয়েটারে অভিনয় করে গেছেন চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় তারকা অভিনেতা হওয়ার পরও। 'সিকন্দর' (১৯৪১) মুক্তি পাওয়ার পরের বছর, চলচ্চিত্রাভিনেতা হিসাবে তাঁর জনপ্রিয়তা যখন রীতিমত প্রতিষ্ঠিত, তখন প্রায় ১৫০ জন শিল্পী ও কলাকুশলীকে নিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন 'পৃথ্বী থিয়েটার'। সারা দেশ ঘুরে ঘুরে থিয়েটার করত পৃথ্বীরাজ কাপুরের এই থিয়েটার কোম্পানি। কালিদাসের 'শকুন্তলা' দিয়ে শুরু। তারপর আড়াই হাজারেরও বেশি প্রযোজনা করেছিল ভ্রাম্যমান এই থিয়েটার কোম্পানিটি। পৃথ্বী থিয়েটারের প্রায় সমস্ত প্রযোজনাতেই পৃথ্বীরাজ নিজে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করতেন। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির ওপর তাঁর ১৯৮৭-এর প্রযোজনা 'পাঠান' কেবল তৎকালীন বম্বে শহরেই মঞ্চস্থ হয়েছে প্রায় ৬০০ রজনী। পৃথ্বীরাজের স্বপ্ন ছিল বম্বে শহরে একটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ গড়ে তোলা। কিন্তু জীবিতাবস্থায় তাঁর সে স্বপ্ন পূরণ হয়নি। যদিও তাঁর পুত্র শশী কাপুর ও স্ত্রী জেনিফার-এর উদ্যোগে সে স্বপ্ন সাকার হয় পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর (১৯৭২) ছয় বছর পরে। ১৯৭৮-এর ৫ই নভেম্বর মুম্বাই-এর জুহু চার্চ রোডে উদ্বোধন হয় ২০০ আসনের স্থায়ী মঞ্চ 'পৃথ্বী থিয়েটার'। উদ্বোধনী নাটক ছিল জি পি দেশপান্ডের 'উদ্ধস্থ ধর্মশালা'। অভিনয় করেছিলেন নাসিরুদ্দিন শাহ, ওম পুরি, বেঞ্জামিন গিলানি প্রমুখ। পৃথ্বীরাজ কাপুরের অভিনয় জীবনে আইপিটিএ-র উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। সিনেমা তাঁকে বিপুল খ্যাতি দিলেও থিয়েটার তাঁর কাছে ছিল সাধনা। তাই তাঁর তিন পুত্র রাজ কাপুর (১৯২৪-৮৮), শাম্মী কাপুর (১৯৩১-২০১১) ও শশী কাপুর (জ. ১৯৩৮)কে ছোটবেলা থেকেই তিনি থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত রেখেছেন। শাম্মী কাপুর ম্যাট্রিক পাশ করেই বাবার পৃথ্বী-থিয়েটারে যোগ দেন। আর শশী কাপুর পৃথ্বী-থিয়েটারে যোগ দেন মাত্র চার বছর বয়সে। শশীর মেয়ে সঞ্জনাও (জ. ১৯৬৭) কিছুদিন আগে পর্যন্ত পৃথ্বী থিয়েটারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। ২০১২-য় তিনি 'জুনুন' নামে তাঁর নিজের থিয়েটার কোম্পানি শুরু করেন।

মূল ধারার বলিউড সিনেমা হোক বা অন্যধারার ছবি, নাসিরুদ্দিন শাহ (জ. ১৯৪৯)-র মতো বড় মাপের চলচ্চিত্রাভিনেতা ভারতীয় সিনেমায় বিরল। ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামার প্রাক্তন ছাত্র নাসিরুদ্দিনের সঙ্গে থিয়েটারের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। ১৯৭৭-এ টম অল্টার ও বেঞ্জামিন গিলানির সঙ্গে তিনি 'মোটলে প্রোডাকশন' নামের একটি নাট্যদলের সূচনা করেন। বয়স বা সিনেমায় কাজের চাপ কোনো কিছুর জন্যই তিনি কখনো থিয়েটারের কাজকে অবহেলা করেন নি। যেমন করেন নি শাবানা আজমি (জ. ১৯৫০), স্মিতা পাতিল (১৯৫৫-৮৬), পঙ্কজ কাপুর (জ. ১৯৫৪), অনুপম খের (জ. ১৯৫৫), শফি ইমানদার (১৯৪৫-৯৬), মনোজ বাজপাই (জ. ১৯৬৯), সীমা বিশ্বাস (জ. ১৯৬৫), নিনা গুপ্তা (জ. ১৯৫৯), রত্না পাঠক (জ. ১৯৫৭), সতীশ কৌশিক (জ. ১৯৫৬), কুলভূষণ খারবান্দা (জ. ১৯৪৪), পরেশ রাওয়াল (জ. ১৯৫০), মোহন আগাসে (জ. ১৯৪৭), আশিস বিদ্যার্থী (জ. ১৯৬২), রাজপাল যাদব (জ. ১৯৭১) প্রমুখের মতো আরও অনেকে, যাঁরা অভিনেতা হিসাবে থিয়েটারের কাজকে সিনেমার মতোই সমান গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন। চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় অভিনেতা হওয়া সত্ত্বেও রঙ্গমঞ্চে অভিনয়কে তাঁরা তাঁদের দায়বদ্ধতা হিসাবেই মেনে নিয়েছেন। এবং সিনেমার কাজের জন্য কখনও থিয়েটারকে অবহেলা করেন নি। অবশ্য এনএমডি-র প্রাক্তনী নাওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকি (জ. ১৯৭৪) যিনি প্রায় সত্তরটি থিয়েটারে অভিনয় করেছেন কিংবা থিয়েটার দিয়েই অভিনয় জীবন শুরু করা মহাতারকা রাজেশ খান্না (১৯৪২-২০১২) বা শাহরুক খান (জ. ১৯৬৫) এর মতো কারও কারও পক্ষে চিত্র জগতের প্রবল ব্যস্ততায় থিয়েটারকে সময় দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি, কিন্তু মঞ্চই যে তাঁদের অভিনয় শিক্ষার ভিত গড়ে দিয়েছে সে ঋণ তাঁরা কখনও অস্বীকার করেন নি।

দাক্ষিণাত্যে চলচ্চিত্র ও রঙ্গমঞ্চ উভয়েরই গণমানসে বিপুল প্রভাব রয়েছে। বিশেষ করে কন্নড় ও তামিল নাট্যচর্চার সুপ্রাচীন ঐতিহ্য এতদঞ্চলের চলচ্চিত্রের ওপরেও বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে। গিরীশ কারনাডের (জ. ১৯৩৮) অভিনয় জীবন শুরু চেন্নাই-এর থিয়েটার দল 'দি মাদ্রাস প্লেয়ারস' থেকে। একই সঙ্গে নট, নাটককার, পরিচালক, অভিনেতা হিসাবে চলচ্চিত্র ও রঙ্গমঞ্চে তাঁর অবাধ সঞ্চরণ। যদিও তাঁর মাতৃভাষা কোঙ্কনী, কিন্তু নাট্যরচনা করেছেন মূলত কন্নড় ভাষায়। এবং অভিনয় করেছেন কন্নড়, তামিল, তেলুগু, মারাঠি, হিন্দি সহ নানা ভাষায়। প্রবাদ প্রতিম কন্নড় অভিনেতা রাজকুমার (১৯২৯-২০০৬) দুই শতাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন যার অধিকাংশই বিপুল জনপ্রিয়। মাত্র আট বছর বয়সে তিনি অভিনয় জীবন শুরু করেছিলেন 'গুব্বি ড্রামা কোম্পানি'তে। তাঁর বাবা ও মা দু'জনেই রঙ্গমঞ্চে নিয়মিত অভিনয় করতেন। বাবার হাত ধরেই তাঁর থিয়েটারে হাতেখড়ি। প্রবাদে পরিণত হওয়া তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এম জি রামচন্দ্রন (১৯১৭-৮৭) চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশের আগে অভিনয়ের পাঠ শুরু করেন 'মাদুরাই অরিজিন্যাল বয়েস কোম্পানি' নামে একটি নাটকের দলে। চলচ্চিত্রে এমজিআর-এর বহু ছবির নায়িকা এবং রাজনীতিতে তাঁর উত্তরাধিকারী তামিলনাড়ুর বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতা (জ. ১৯৪৮) অভিনয়ে এসেছিলেন মাত্র ষোলো বছর বয়সে থিয়েটারের হাত ধরে। বিখ্যাত তামিল নাটককার ওয়াই জি পার্থসারথি'র নাটকে ১৯৬৪ সালে তাঁর প্রথম অভিনয়। পরের বছরেই পার্থসারথি'র 'মালতী' নাটকে তিনি প্রথম নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন। জয়ললিতার পরবর্তী জীবনটাই এক বিরাট নাটক এবং সে নাটকে অদ্যাবধি তিনি অবিসংবাদী নায়িকা।

বাংলার উল্লেখযোগ্য নাট্যব্যক্তিত্ব উৎপল দত্ত (১৯২৯-৯৩) কালজয়ী সব নাট্যপ্রযোজনার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সিনেমাকেও সমৃদ্ধ করেছেন তার অত্যুজ্জ্বল অভিনয় প্রতিভায়। হিন্দি ও বাংলা মিলিয়ে প্রায় দু'শ ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি, যার মধ্যে আছে সত্যজিৎ রায়ের 'জলঅরণ্য' (১৯৭৬), 'জয় বাবা ফেলুনাথ' (১৯৭৯), 'হীরক রাজার দেশে' (১৯৮০), 'আগন্তুক' (১৯৯১); মৃণাল সেনের 'ভুবন সোম' (১৯৬৯), 'কলকাতা ৭১' (১৯৭১), 'কোরাস' (১৯৭৪), হৃষিকেশ মুখার্জির 'গুড্ডি' (১৯৭১), 'গোলমাল' (১৯৭৯), 'নরম গরম' (১৯৮১); শক্তি সামন্তর 'অমানুষ' (১৯৭৫); পিনাকী মুখার্জির 'চৌরঙ্গী' (১৯৬৮); তপন সিনহার 'সফেদ হাতি' (১৯৭৮); সেথুমাধবনের 'জুলি' (১৯৭৫); সলিল সেনের 'ছুটির ফাঁদে' (১৯৭৫); গৌতম ঘোষের 'পদ্মা নদীর মাঝি' (১৯৯৩) প্রভৃতির মতো স্মরণীয় সব ছবিতে তাঁর অবিস্মরণীয় সব অভিনয়। ভুবন সোম ও হীরক রাজা-ই শুধু নয়, 'গোলমাল'-এ ভবানী শঙ্কর, 'আগন্তুক'-এর মনমোহন মিত্র, 'পদ্মা নদীর মাঝি'-র হুসেন মিঞা, 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এর মগন লাল মেঘরাজ, 'অমানুষ'-এর মহিম ঘোষাল, 'চৌরঙ্গী'-র মার্কোপোলো চরিত্রগুলি আজও স্মরণীয় হয়ে আছে তাঁর অভিনয় প্রতিভায়। যে প্রতিভার সৃষ্টি ও বিকাশ

বাংলা রঙ্গমঞ্চে। উৎপল দত্ত 'ক্যালকাটা লিটল থিয়েটার গ্রুপ' প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৪৭-এ। 'শেকস্‌পিরীয়ান ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার কোম্পানি'র সঙ্গে নাট্যপরিক্রমায় বেরোন দু'বার, প্রথমবার ১৯৪৭ থেকে ১৯৪৯ এবং দ্বিতীয়বার ১৯৫৩-৫৪তে। ১৯৫৪ থেকে শুরু করেন নাট্য রচনা ও পরিচালনা। ১৯৫৯-এ 'অঙ্গার' বাংলা রঙ্গমঞ্চকে আলোড়িত করে। তাঁর 'কল্লোল', 'মানুষের অধিকার', 'দুঃস্বপ্নের নগরী', 'ব্যারিকেড', 'এবার রাজার পালা', 'টিনের তলোয়ার' প্রভৃতি বহু নাটক বাঙালির স্মৃতিতে এখনও উজ্জ্বল।

আইপিটিএ-র নাটককার, পরিচালক ও অভিনেতা হিসাবে ঋত্বিক ঘটক (১৯২৫-১৯৭৬)-এর নাট্যচর্চার সূচনা। ১৯৫০-এ নিমাই ঘোষের 'ছিন্নমূল' ছবিতে তিনি যখন অভিনেতা ও সহকারি পরিচালক হিসাবে কাজ করছেন, তার দু'বছর আগেই তিনি লিখেছেন তাঁর প্রথম নাটক 'কালো সায়র' (১৯৪৮)। ১৯৫১-য় 'নবান্ন' প্রযোজনাতেও সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল তাঁর। ১৯৫২-য় তিনি তাঁর প্রথম ছবি 'নাগরিক'-এর কাজ শেষ করেছিলেন, যদিও দুর্ভাগ্যবশতঃ ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল ১৯৭৭ সালে। সঠিক সময়ে মুক্তি পেলে নতুন ধারার ভারতীয় ছবির সূচনা পর্বের ইতিহাস হয়তো অন্যরকমভাবে লেখা হত। ১৯৫৩-য় বম্বেতে আইপিটিএ-র জাতীয় সম্মেলনে তাঁর লেখা নাটক 'দলিল' শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা হিসাবে নির্বাচিত হয়। আইপিটিএ-র সঙ্গে মতাদর্শগত বিভেদের পর তাঁর উল্লেখযোগ্য নিজস্ব নাট্য প্রযোজনা 'সেই মেয়ে' (১৯৬৯)। অবশ্য তার অনেক আগেই তাঁর প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'অযান্ত্রিক' (১৯৫৮) এবং বাংলার থিয়েটার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি 'কোমল গান্ধার' (১৯৬১) মুক্তি পেয়েছে। ঋত্বিক চলচ্চিত্র নির্মাণের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন মূলত থিয়েটার থেকেই, কারণ তাঁর মনে হয়েছিল সিনেমা স্রষ্টার বক্তব্য আরও সম্যকভাবে তুলে ধরতে পারে।

বাংলা সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেতা উত্তমকুমার (১৯২৬-৮০) থেকে শুরু করে, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (জ. ১৯৩৫), মাধবী মুখোপাধ্যায় (জ. ১৯৪২), সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় (জ.১৯৩৭), ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২০-৮৩), রবি ঘোষ (১৯৩১-৯৭), অনুপকুমার (১৯৩০-৯৮), অপর্ণা সেন (জ. ১৯৪৫), অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৩-৮৩), মনোজ মিত্র (জ. ১৯৩৮), রমাপ্রসাদ বনিক (১৯৫৪-২০১০), রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত (জ. ১৯৩৫) প্রমুখ অনেকেই অভিনয় জগতে এসেছেন মূলত রঙ্গমঞ্চ থেকেই। এঁদের মধ্যে অনেকেই চলচ্চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত থিয়েটারেও কাজ করেছেন বা এখনও করে চলেছেন সমান বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব দিয়ে। এই ধারাবাহিকতা বহন করে পরবর্তী প্রজন্মে যাঁরা বাংলা থিয়েটার ও চলচ্চিত্রকে একই সঙ্গে সমৃদ্ধ করে চলেছেন তাঁদের মধ্যে ব্রাত্য বসু (জ. ১৯৬৯), সুমন মুখোপাধ্যায় (জ. ১৯৬৬), কৌশিক সেন (জ. ১৯৬৮), দেবশঙ্কর হালদার (জ. ১৯৬৫) প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে সুমন মুখোপাধ্যায় নাট্য পরিচালনা ও চলচ্চিত্র পরিচালনা—দুটির মধ্যেই ভারসাম্য রেখে চলেছেন। কৌশিক সেন ও দেবশঙ্কর হালদার দুটি মাধ্যমেই অভিনয় করে চলেছেন তুমুল আগ্রহে। ব্রাত্য বসু একই সঙ্গে চলচ্চিত্র পরিচালক, চলচ্চিত্রাভিনেতা, নাটককার, নাট্য পরিচালক ও নাট্যাভিনেতা হিসাবে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছেন। সুমন মুখোপাধ্যায়ের 'হারবার্ট' (২০০৬)-এ ধন্না, অনিকেত চট্টোপাধ্যায়ের 'মহাপুরুষ ও কাপুরুষ' (২০১৩)-এ সদ্গজানন্দ, সঞ্জয় নাগের 'পারাপার' (২০১৪)-এ গোপাল, দেবেশ চট্টোপাধ্যায়ের 'নাটকের মতো' (২০১৫)-য় অমিতেশ, শেখর দাসের 'যোগাযোগ' (২০১৫)-এ মধুসূদন, দেবারতি গুপ্তের 'কল্কিযুগ' (২০১৫)-এ এসিপি দিলীপ দত্ত, অতনু ঘোষের 'অ্যাবি সেন' (২০১৫)-এ গ্র্যান্ড চ্যানেলের ডিরেক্টরের মতো কিছু গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে যদিও তিনি বাংলা ছবির দর্শকদের নজর কেড়েছেন কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বাংলা সিনেমা এখনও পর্যন্ত তাঁর অভিনয় প্রতিভাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেনি। কিন্তু 'অশালীন' (১৯৯৬) থেকে শুরু করে 'সিনেমার মতো' (২০১৩-১৫) পর্যন্ত কুড়ি বছর ধরে বহু নাটকে তাঁর স্মরণীয় অভিনয় নিঃসন্দেহে বাংলা থিয়েটারকে সমৃদ্ধ করেছে। যুগপৎ বিপুল জনপ্রিয়তা ও উচ্চ-প্রশংসা অর্জন করেছে তাঁর অভিনীত, লিখিত ও পরিচালিত অধিকাংশ নাটক। হয়তো সেজন্যই ব্রাত্য বসু তাঁর কাজে সিনেমার থেকে থিয়েটারকেই বেশি প্রাধান্য দিয়ে চলেছেন। 'রাস্তা' (২০০৩), 'তিস্তা' (২০০৫) ও 'তারা' (২০১০)-র মতো তিনটি বাস্তবধর্মী ছবি তৈরি করলেও বহুপ্রসবী নাটককার ও জনপ্রিয় নাট্য পরিচালক হওয়ার অতিরিক্ত দায়বদ্ধতায় তাঁর চলচ্চিত্র নির্মাণে মনোনিবেশের দিকটি এখনো পর্যন্ত অবহেলিত থেকে গেছে। যদিও একথা স্বীকার করতেই হবে যে, সিনেমা নিয়ে তাঁর থিয়েটারি পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাংলা থিয়েটারে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সামগ্রিকভাবে বাংলা সিনেমার ইতিহাসকে বিষয়বস্তু করে তাঁর নাটক 'সিনেমার মতো' (২০১৩)-তে তিনি সিনেমার আঙ্গিককে

নাটকীয় উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেছেন। আবার বলিউড ঘরানার জনমনোরঞ্জক উপাদান ও আঙ্গিক ব্যবহার করে তৈরি করেছেন 'মুম্বাই নাইটস্' (২০১৫)-এর মতো অত্যন্ত জনপ্রিয় নাটক যার বিষয়বস্তুও গড়ে ওঠে বলিউডি কাহিনিকে কেন্দ্র করে বলিউডের জনমোহিনী কাহিনি বিন্যাসের ছাঁচে। অন্যদিকে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে গিয়ে ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা' (১৯৬০)-র মতো একটি প্রবাদ-প্রতিম ছবিকে সরাসরি মঞ্চস্থ করেছেন তাঁর সাম্প্রতিকতম নাটক 'মেঘে ঢাকা তারা' (২০১৬)-য়। এমনকি সিনেমাটির কিছু নির্বাচিত দৃশ্যকে মঞ্চস্থ চিত্রপটে চলচ্চিত্র হিসাবেই দেখিয়ে তাকে সম্পৃক্ত করা হয় দৃশ্যগুলির প্রত্যক্ষ মঞ্চায়নে। এভাবে ব্রাত্য ঋত্বিক ঘটকের মঞ্চ থেকে চলচ্চিত্র যাত্রার একটি বিপ্রতীপ প্রস্তাবনাকে পরীক্ষামূলকভাবে উপস্থাপিত করেন দর্শকদের সামনে। নিজস্ব নিরীক্ষায় থিয়েটার ও সিনেমার আন্তর্সম্পর্ককে এক নতুন মাত্রায় এনে হয়তো তিনি একথাই বোঝাতে চান যে, সিনেমা যতই শক্তিশালী শিল্পমাধ্যম হিসাবে নিজেকে প্রমাণ করে উঠুক না কেন থিয়েটারের কাছে তার ঋণ অপরিশোধ্য।

ভারতবর্ষের প্রথম চলচ্চিত্রকার হীরালাল সেন (১৮৬৬-১৯১৭) এই উপমহাদেশের প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ সংস্থা 'দি রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানি' প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৯৮ সালে। এই কোম্পানি পরবর্তী ১৫ বছরে প্রায় ৪০টি চলচ্চিত্র নির্মাণ করে যার সবকটিই অমরেন্দ্র দত্তর 'ক্লাসিক থিয়েটার'-এর বিভিন্ন নাট্য প্রযোজনার চলমান চিত্ররূপ। রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানি'র দীর্ঘতম প্রযোজনা 'আলিবাবা ও চল্লিশ চোর' (১৯০৩) ক্লাসিক থিয়েটারের নাট্য প্রযোজনারই চলচ্চিত্ররূপ। পরবর্তীকালে জামশেদজি ফ্রামজি ম্যাডান (১৮৫৬-১৯২৩)-এর 'ম্যাডান থিয়েটার' ও 'এলফিনস্টোন বায়োস্কোপ কোম্পানি' বা বীরেন্দ্র নাথ সরকার (১৯০১-৮০)-এর নিউ থিয়েটার্সকে কেন্দ্র করে কলকাতায় চলচ্চিত্র শিল্পের যে প্রাণকেন্দ্র গড়ে ওঠে সেখানেও বাংলা রঙ্গমঞ্চের ব্যাপক প্রভাব অনস্বীকার্য।

একথা প্রমাণিত সত্য যে, কোনো ভাষার থিয়েটার যদি সমৃদ্ধ হয় তাহলে তার ইতিবাচক প্রভাব সিনেমার ওপরে পড়তে বাধ্য। উদাহরণ দিতে আমরা আলোচনাটি যেখান থেকে শুরু করেছিলাম আবার সেই মারাঠি সিনেমাতেই ফিরে আসতে পারি। দাদা সাহেব ফালকে (১৮৭০-১৯৪৪)-র মারাঠি ছবি 'রাজা হরিশচন্দ্র' (১৯১৩) দিয়ে ভারতীয় সিনেমার সরকারি ইতিহাসের যাত্রা শুরু। তার ঠিক আগের বছর রামচন্দ্র গোপাল দাদাসাহেব তোর্ণে (১৮৯০-১৯৬০)-র তৈরি 'শ্রী পুন্ডলিক' (১৯১২) মুক্তি পেয়েছিল। ২২ মিনিট দীর্ঘ এই ছবিটিও আসলে ছিল একটি জনপ্রিয় মারাঠি নাটকের চলচ্চিত্র প্রতিরূপ। এইসব ইতিহাস কিন্তু মারাঠি সিনেমাকে কিছুদিন আগে পর্যন্তও কোনো প্রতিষ্ঠা দিতে পারেনি। সন্দীপ সাওয়ান্তের 'শ্বাস' (২০০৪) মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই মারাঠি ছবির প্রেক্ষাপট দ্রুত বদলাতে থাকে। ভারতে তো বটেই, সারা পৃথিবীর চলচ্চিত্রামোদী মানুষের নজরে আসতে থাকে একের পর এক দুর্দান্ত সব মারাঠি ছবি—নিশিকান্ত কামাথের 'দম্বিভেলি ফাস্ট' (২০০৫), পরেশ মোকাশির 'হরিশ্চন্দ্রচি ফ্যাক্টরি' (২০০৯) ও 'এলিজাবেথ একাদশী' (২০১৪), নাগরাজ মঞ্জুলের 'ফ্যান্ড্রি' (২০১৩) ও 'সইরাট' (২০১৬), রত্নাকর মাতকড়ির 'ইনভেস্টমেন্ট' (২০১৩), অবিনাশ অরুণের 'কিল্লা' (২০১৪), চৈতন্য তামহানের 'কোর্ট' (২০১৪), মকরন্দ মানের 'রিঙ্গন' (২০১৫), মহেশ মঞ্জরেকারের 'কাকস্পর্শ' (২০১২) ও 'নটসম্রাট' (২০১৬), রবি যাদবের 'নটরঙ্গ' (২০১০)... উদাহরণ অনেক।

'নটসম্রাট'-এর মতো 'নটরঙ্গ'-র বিষযবস্তুও মারাঠি নাটক। এক গ্রাম্য যুবকের মারাঠি লোকনাট্য 'তামাশা'র প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণকে উপজীব্য করে মারাঠি লোকনাট্য চর্চার ইতিহাসকে এক কাব্যিক সুষমায় চলচ্চিত্রায়িত করা হয়েছে 'নটরঙ্গ' ছবিটিতে। প্রখ্যাত মারাঠি সাহিত্যিক আনন্দ যাদবের বিখ্যাত উপন্যাস 'নটরঙ্গ' অবলম্বনে নির্মিত এই ছবি মারাঠি সিনেমায় কি বাণিজ্য সাফল্যে, কি সমালোচকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। অতএব ভাবা যেতে পারে, মারাঠি নাটক মারাঠি সিনেমাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে চলেছে। ভাবনাটা কতটা সঠিক দেখা যাক।

১৯৬০-এর দশকেই মহারাষ্ট্র সরকার মারাঠি থিয়েটার, লোকনাট্য সাহিত্য ইত্যাদির পৃষ্ঠপোষকতায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। মূলত সরকারি সহযোগিতা ও উৎসাহের ফলশ্রুতিতে একদিকে বলিউড ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির বিপুল চাপ অন্যদিকে টেলিভিশনের বিশাল প্রভাবকে উপেক্ষা করে মারাঠি থিয়েটার একটি সফল 'ইন্ডাস্ট্রি'তে পরিণত হয়। বিষয়টি আরও উৎসাহিত হয় যখন মহারাষ্ট্র সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক 'রাজ্য নাট্য প্রতিযোগিতা'র আয়োজন শুরু করে। শুধু তাই নয়, সংস্কৃতি মন্ত্রকের উদ্যোগে শুরু হয় নিয়মিতভাবে 'নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা' যেখানে শুধু মহারাষ্ট্রই নয়, সারা দেশ থেকে বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্বদের আমন্ত্রণ জানান হয় প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য।

সংস্কৃতি মন্ত্রকের কাজে উৎসাহিত হয়ে অন্য দপ্তরগুলিও এগিয়ে আসে। কিছুদিনের মধ্যেই শ্রম ও শিল্পোদ্যোগ মন্ত্রকের ব্যবস্থাপনায় শুরু হয় 'কামগার কল্যাণ নাট্যস্পর্ধা', অর্থাৎ শ্রমিক কল্যাণ নাট্য প্রতিযোগিতা—নিঃসন্দেহে যা এক অভিনব প্রয়াস। বিভিন্ন কলকারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে সুপ্ত নাট্য প্রতিভা অন্বেষণে কোনো সরকারের শ্রম দপ্তর এভাবে এগিয়ে এসেছে সম্ভবত এমন দৃষ্টান্ত দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে না। একইভাবে সরকারি উদ্যোগে শুরু হয় 'সংগীত নাট্য স্পর্ধা', 'সংস্কৃত নাট্য স্পর্ধা', 'হিন্দি নাট্য স্পর্ধা' সহ আরও নানা নাট্য প্রতিযোগিতা যা মহারাষ্ট্রের নাট্যচর্চাকে প্রবলভাবে উৎসাহিত করে। সরকারি প্রয়াসের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগেও নাট্যচর্চাকে উৎসাহিত করতে শুরু হয় 'উন্মেষ যুবক একাঙ্কিকা স্পর্ধা', 'ইন্টার কলেজ একাঙ্কিকা স্বর্ধা', 'পার্শ্বনাথ আল্টেকার নাট্য স্বর্ধা' সহ রাজ্যব্যাপী বহু বিখ্যাত নাট্য প্রতিযোগিতা, যার ফলে ছাত্র-যুব থেকে শুরু করে সমাজের বিভিন্ন স্তরের, বিভিন্ন পেশার মানুষ নাট্যচর্চাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। বলা হয়, প্রতি তিনটি মারাঠি পরিবারের একটিতে এমন কেউ না কেউ অবশ্যই আছেন যিনি মারাঠি নাট্যচর্চার সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে জড়িত। মারাঠি থিয়েটারের এই বিপুল বৈভব বলিউডকে সমৃদ্ধ করেছে উদারভাবে। ছোট, বড়, মাঝারি বহু অভিনেতা মারাঠি থিয়েটার থেকে এসে হিন্দি ছবিতে কাজ করে চলেছেন। ধীরে ধীরে কলাকুশলী, নাটককার, পরিচালকরাও চলচ্চিত্রে আগ্রহ নিতে শুরু করেন। শুরু হয় মারাঠি সিনেমার এক নতুন যাত্রা। মনে রাখতে হবে মহারাষ্ট্র সরকার নাট্যচর্চাকেই শুধু উৎসাহিত করেন নি, একই সঙ্গে মারাঠি লোক শিল্প, বিশেষত লোকনাট্য, সাহিত্য, সঙ্গীত ও চলচ্চিত্র চর্চাকেও সরাসরি উৎসাহিত করে চলেছেন নানা কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে। সরকারের উদ্যোগেই শুরু হয়েছে বার্ষিক 'রাজ্য চিত্রপট মহোৎসব', যেখানে মারাঠি ছবিগুলিকে বিভিন্ন বিভাগে পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে এবং পুরস্কারের সংখ্যা ও নগদ অর্থমূল্য প্রতি বছর বেড়েই চলেছে। থিয়েটারের মতোই চলচ্চিত্র নির্মাণকেও উৎসাহিত করতে মহারাষ্ট্র সরকারই প্রথম প্রমোদকর প্রত্যাবর্তন নীতি চালু করে, যা পরে আরো কয়েকটি রাজ্য সরকার গ্রহণ করে। মারাঠি ছবিকে উৎসাহিত করার জন্য রাজ্য সরকারের অনুদান প্রকল্পও অত্যন্ত সহায়ক। সর্বাধিক ৪০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অনুদান দেওয়া হয় সরকারি তহবিল থেকে ছবি তৈরির জন্য। বিস্তারিত না গিয়ে বলা যায় যে, একই সঙ্গে থিয়েটার ও সিনেমাকে সক্রিয়ভাবে উৎসাহিত করে উভয়েরই গুণগত মান বৃদ্ধিতে মহারাষ্ট্র সরকার যেভাবে সহায়কের ভূমিকা পালন করে চলেছেন দীর্ঘ প্রায় ছয় দশক ধরে, তা যে কোনো সরকারের কাছেই আদর্শ হওয়া উচিত।

জনপ্রিয়তার জন্য চিত্রতারকাদের যথেচ্ছ ব্যবহার করে নির্বাচনী রাজনীতিতে হয়তো কিছু তাৎক্ষণিক সুবিধা পাওয়া যায়, কিন্তু তা সংস্কৃতি বিকাশের সহায়ক হিসাবে আদপেই কাজ করে না। সে কাজ করতে হলে প্রথমেই সস্তা জনপ্রিয়তার মোহ ত্যাগ করে তৃণমূল স্তরে সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য নিরপেক্ষ সার্বিক নীতি প্রণয়ন প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে নাট্যচর্চা ও চলচ্চিত্র চর্চাকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করা দরকার। দুঃখের বিষয় বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা সিনেমার এক গরিমাময় ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও অদ্যাবধি রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বাংলা নাট্য প্রতিযোগিতা বা প্রতিযোগিতামূলক বার্ষিক বাংলা চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হল না। তা সত্ত্বেও বাংলা থিয়েটার স্বাধীনভাবে যে সব কাজ করে চলেছে তা অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবি রাখে। তুলনায় বাংলা সিনেমা ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে, বিশেষত মালায়ালাম বা মারাঠি সিনেমার কাছে তো বটেই। হয়তো থিয়েটারই পারবে শেষ পর্যন্ত বাংলা সিনেমাকে আবার তার পুরোনো গৌরব ফিরিয়ে দিতে।